ভাষা—বাংলা ভাষা—ভাষারীতি ঃ সাধু ও চলতি ভাষা ২

ভাষা ঃ মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কথা বলে। এই কথাই মানুষের ভাষা। মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তা যদি কোন অর্থ প্রকাশক হয় তবে তা ভাষার মর্যাদা পায়। বাগযন্ত্র বা কথা বলার যন্ত্র বলতে গলা, দাঁত, মাড়ি, জিব, ঠোঁট, নাক, তালু, মুখের গর্ত—এসব বোঝায়। গলা থেকে শব্দ বেরিয়ে মুখের নানা জায়গায় স্পর্শ করে ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ধ্বনি মিলে হয় শব্দ। শব্দের থাকে অর্থ। এভাবে মানুষ মনের ভাবের যথাযথ প্রকাশ ঘটায় শব্দের মাধ্যমে।

ভাষার এই পরিচয় থেকে তার উপযুক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা চলে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, মানব জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসকল দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম ভাষা। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন, মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের মতে—মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে অপরের বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির উচ্চারণ করে থাকে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলা হয়। বাগযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে ইঙ্গিত দ্বারাও মনের ভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করা যায় ; তা ভাষা নয়—ভাষার প্রতিনিধি মাত্র।

এ থেকে ভাষার বৈশিষ্ট্য এভাবে নির্ধারণ করা যায় ঃ

ক. ভাষা হবে মনোভাব প্রকাশক।

খ. ধ্বনিসহযোগে তা উচ্চারিত হবে।

গ. ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ থাকতে হবে।

ঘ. বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত হতে হবে।

ঙ. ধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হবে।

অর্থবহতা ভাষার প্রধান গুণ। মুখ দিয়ে ভাষা হিসেবে যে ধ্বনি বের হবে তার অর্থ থাকতে হবে এবং তা হবে মনের ভাব প্রকাশের বাহন। আবার এই ভাষা অন্যের কাছে বোধগম্য হতে হবে। এ কারণে পশুপাখির কথা ভাষা হিসেবে বিবেচনার দাবি করতে পারে না।

পৃথিবীতে আসার পর থেকেই মানুষ কথা বলে ভাষার সৃষ্টি করেছে। আদি মানবের যে ভাষা ছিল তা মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে কালক্রমে বহু ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজকের পৃথিবীতে ৫০০ কোটি মানুষের ভাষার সংখ্যা আড়াই হাজার বলে অনুমান করা হয়।

বাংলা ভাষা ঃ বাংলাদেশের অধিবাসীরা প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় কথা বলত না। বাংলা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে বলে প্রাক-আর্য যুগের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়। তবে সেসব ভাষার শব্দসম্ভার রয়েছে বাংলা ভাষায়। অনার্যদের তাড়িয়ে আর্যরা এদেশে বসবাস শুরু করলে তাদেরই আর্যভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেছেন, খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেসব প্রাচীন শাখার সৃষ্টি হয়, তার অন্যতম হল আর্য় শাখা। এ থেকেই ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি। এর কাল ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তর ঃ

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক-সংস্কৃত), খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত।

খ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ), খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত।

গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, আসামি ইত্যাদি) খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত।

ভারতীয় আর্যভাষার এই স্তরবিভাগ থেকে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। জনতার প্রভাবে এ ভাষা পরিবর্তিত হয়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরে আসে। প্রথম পর্যায়ে পালি এবং পরে প্রাকৃত ভাষা নামে তা চিহ্নিত হয়। অঞ্চলভেদে প্রাকৃত ভাষা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি ছিল মাগধি প্রাকৃত। এ ভাষার প্রাচ্যতর রূপ গৌড়ী প্রাকৃত। তা থেকে গৌড়ী অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। এই পর্যায়ের অন্যান্য ভাষা হল মৈথিলি, মগধি, ভোজপুরিয়া, আসামি ও উড়িয়া। বাংলা ভাষার জন্মকাল কেউ কেউ দশম শতাব্দী নির্ণয় করেছেন।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী। অন্যূন হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষা উৎপত্তির পর থেকে নানা পর্যায়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে আদি, মধ্য, আধুনিক— এই তিন যুগের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। আদি বা প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার কাল দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ের প্রধান নিদর্শন চর্যাপদ। এ ভাষা থেকে তখন পর্যন্ত তার পূর্ববর্তী অপভ্রংশের প্রভাব দূর হয়ে যায়নি, এমন কি প্রাকৃতের প্রভাবও তাতে বর্তমান ছিল। তবে এখানেই বাংলা ভাষা তার স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলা ভাষার মধ্যযুগের পরিধি ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও এ সময়ে বাংলা ভাষা বিবর্তিত হচ্ছিল বলে মনে করা যায়। কারণ চর্যাপদ থেকে মধ্যযুগের প্রথম গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষায় উন্নীত হওয়ার জন্য বিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। মধ্যযুগের আদিস্তর চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে সীমাবদ্ধ। এ সময়ের নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর-শ্রীকর নন্দীর মহাভারত পাঁচালী, নারায়ণদেব-বিপ্রদাস-বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য, মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার প্রয়োগ, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ব্যবহার এ যুগের লক্ষণ। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অন্ত্যযুগ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এ সময়ে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য ও পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচুর তৎসম শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পায়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি ভাষার প্রভাব পড়ে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা মৈথিলি মিশ্রিত ব্রজবুলি কৃত্রিম কাব্যভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন এবং তাঁর হাতেই বাংলা ভাষা মার্জিত রূপ লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের ব্যবহার হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পর্তুগিজ মিশনারিরা রোমান হরফে বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অবশ্য তার পূর্বেই বাংলা ভাষায় কিছু পর্তুগিজ শব্দ প্রবেশ করে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিধিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যের নিদর্শন রূপায়িত হয়েছে। এই সৃষ্টি দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটেছে, আবার বহু যুগ ধরে তা ছড়িয়ে আছে। ফলে ভাষার বৈচিত্র্য খুব স্বাভাবিকভাবেই এসব সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষা তখন বিবর্তনের মাধ্যমে উৎকর্ষের দিকে ধাবিত হয়েছে। ভাষায় এসেছে নানা জাতের শব্দ. এসেছে শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ। সব ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি সাধনের একটা প্রচেষ্টা লক্ষণীয় ছিল। প্রতিভাশালী লেখকের হাতে ভাষা উৎকর্ষমণ্ডিত হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে বাস্তবধর্মিতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়ে ভাষা ক্রমেই জীবনানুসারী হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ভাষা তাই বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

আধুনিক বাংলা ভাষার স্তর ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রবহমান। এ যুগের প্রথম থেকেই বাংলা গদ্যেব ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। প্রথম দিকে কিছুটা জড়তা থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা গদ্যের একটা পবিণত রূপ গড়ে ওঠে। কলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষাও গদ্যরীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সমগ্র বাংলাদেশে যে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা একমাত্র ব্যবহার্য ভাষা হিসেবে প্রচলিত হয়, তা-ই সাধু ভাষা নামে পরিচিত। এ ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা। পরবর্তী পর্যায়ে কথ্য ভাষারীতি সাহিত্যে স্থান গ্রহণ করে এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে কথ্য বা চলতি ভাষা সাধু ভাষার পাশাপাশি চলতে থাকে। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যে সাধু রীতির চেয়ে কথ্য রীতির প্রাধান্য বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আধুনিক বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের উন্নত দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশে প্রচারিত হচ্ছে। ফলে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষা ক্রমেই অধিকতর যোগ্য হয়ে উঠছে। তাছাড়া বাংলা এখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহাবে নিজের যথোপযুক্ততা প্রমাণ করছে এবং প্রয়োজনবোধে বাইরের প্রভাবে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলছে।

আধুনিক বাংলা ভাষা যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে এখনও সম্প্রসারমান। ছাপাখানা ভাষাকে স্থায়ী রূপ দান করলেও তার পরিবর্তন অব্যাহত রয়েছে। বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে ইসলামী ও সংস্কৃত প্রভাব, ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে পুরানো বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত বাক্যবিন্যাস ও সমাস সন্ধির গুরুভার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। ভাষায় স্থান লাভ করেছে কলকাতাকেন্দ্রিক চলতি রীতি। এখনও ভাষায় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে তার পরিবর্তন চলছে। সমকালীন জীবনচেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দাবলী ভাষায় স্থান করে নিচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের নিজস্ব পরিসরে স্বকীয় ভাষা প্রয়োগরীতি অনুপ্রবেশ করে এখনকার বাংলা ভাষাকে ক্রমেই সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য দান করছে।

আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পদ্যে রূপ লাভ করেছে। গদ্য এসেছে আধুনিক যুগে। গদ্যের দুটি ভাষারীতি— সাধু ও চলতি। সাধু রীতি সাহিত্যের ভাষা, বইপত্রে সীমাবদ্ধ। চলতি রীতি ছিল মুখের ভাষা। সাধু রীতির পাশে তা যথাযোগ্য মর্যাদা নিয়ে স্থান লাভ করেছে। এখনকার দিনে চলতি রীতির প্রাধান্যই বেশি। আধুনিক ভাষারীতি হিসেবে চলতি রীতি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই দুই ভাষারীতির বাইরে আছে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা। দেশের বিভিন্ন এলাকার শব্দ ব্যবহার, উচ্চারণে ও বাক্য গঠনে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আঞ্চলিক ভাষারীতি গড়ে উঠেছে এবং সাহিত্যেও কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

বাংলা ভাষারীতি ঃ সাধু ও চলতি ভাষা

বাংলা ভাষার দুটি রূপ— একটি সাহিত্যের ভাষায় বা লেখায় ব্যবহৃত হয়, তার নাম লেখ্যরূপ। আর একটি মুখের কথায় ব্যবহৃত হয়, তার নাম কথ্যরূপ। বাঙালিরা বাংলা ভাষা সৃষ্টির পর বরাবরই কথ্যরূপ ব্যবহার করে মনোভাব প্রকাশের জন্য ভাষার প্রয়োগ করেছে। কিন্তু সাহিত্য রচনার বেলায় একটি মার্জিত উৎকর্ষপূর্ণ ভাষা রূপ প্রয়োগ করেছে। সাহিত্যের এই রূপের সাথে মুখের কথার রূপের মিল নেই— দুই রূপ এক রকম নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য রচিত হয়েছে কবিতায়। বাঙালিরা গদ্যে কথা বললেও সাহিত্যের জন্য দীর্ঘদিন কবিতাকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। ১৮০০ সাল থেকে আধুনিক যুগ শুরু হলে কবিতার পাশাপাশি সাহিত্যে গদ্যভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে এবং গদ্যের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে গদ্যভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি—গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচিত হতে থাকে।

বাংলা গদ্যের বিকাশের প্রথম দিকে গদ্যের একটা বিশেষ রূপ সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তার নাম সাধুরীতি। তখনও বাঙালিরা মুখের কথায় কথ্যরীতি ব্যবহার করেছে। কিন্তু সাহিত্যের ভাষার জন্য কৃত্রিম এই সাধুরীতি তৈরি করে সাহিত্যে প্রয়োগ করেছে। তখন লেখকগণের ধারণা ছিল সাহিত্যের ভাষা দৈনন্দিন মুখের ভাষা থেকে পৃথক হবে এবং তা হবে ভাষার মার্জিত রূপ।

এর ফলে বাংলা ভাষায় দুটি রূপ লক্ষণীয়— একটি গদ্যসাহিত্যের জন্য এবং অপরটি মুখের কথাব জন্য। মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষার এই পার্থক্য থাকার জন্য সাহিত্যের ভাষাকে কৃত্রিম বলে বিবেচনা করা হয়। সাহিত্যের ভাষা থেকে এই কৃত্রিমতা দূর করে মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে ভাষাকে বাস্তবভিত্তিক করার জন্য সাহিত্যে মুখের ভাষা কথ্যরীতির ব্যবহার

শুরু হয় এবং বর্তমানকালে এই কথ্যরীতিই সাহিত্যে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। এমন সময় হয়ত বেশি দূরে নয় যখন সাধুরীতি প্রাচীন রীতি হিসেবে সাহিত্যের পুরানো নমুনায় বিরাজ করবে। আর কথ্যরীতিই সর্বত্র তার আধিপত্য ছড়িয়ে দিবে।

বাংলা ভাষারূপের এই ভিন্নতার প্রেক্ষিতে গদ্যরীতিতে দুটি পৃথক রূপ বিদ্যমান। একটি সাধু ভাষারীতি, অপরটি কথ্য বা চলতি ভাষারীতি।

কবিতায় ভাষারীতির ব্যবহার সম্পর্কে এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে। কবিতার বেলায় সাধু-কথ্যের পার্থক্য দেখা হয় না। বরং কবিতার ভাষায় সাধু-কথ্যের মিশ্রণে কোন দোষ বিবেচনা করা হয় না। গদ্যের জন্য এই মিশ্রণ সম্পূর্ণ দোষের। কবিতা রচনার সময় কবিকে নির্দিষ্ট মাপে শব্দ ব্যবহার করতে হয়। ছন্দের রীতি অনুসরণ করে বিশেষ বিশেষ মাপে শব্দের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। পংক্তির শেষে মিল রাখতে হয়। ফলে কবিরা শব্দের ব্যবহারে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাই কবিগণের বেলায় সাধু আর কথ্যরীতি মিশ্রণ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।'—এই দৃষ্টান্তে 'উহারে' শব্দটি সাধুরীতির। কিন্তু 'দেখে' ক্রিয়াপদ কথ্যরীতির। সাধুরীতির সর্বনাম পদ 'উহারে' কথ্যরীতিতে পরিবর্তিত করে 'ওরে' করলে কবিতার ছন্দপতন ঘটবে। আরেকটি নমুনা ঃ

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

এখানে 'উঠিয়া' ক্রিয়াপদ সাধুরীতির, আর 'হয়ে' ক্রিয়াপদ কথ্যরীতির। দুটিকে যে কোন এক রীতিতে প্রয়োগ করলে কবিতার জাতমারা হবে। কবিরা ছন্দ মিলানোর সুবিধার জন্য এ ধরনের সাধু-কথ্যের মিশ্রণ ঘটানোর ব্যাপারে সাত খুন মাফ পেয়ে থাকেন। তাহলে বাংলা গদ্য ভাষারীতির দুটি রূপ—১. সাধু রীতি ও ২. কথ্য বা চলতি রীতি।

সাধু ভাষা ঃ যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় তাকে সাধু ভাষারীতি বলে। যেমন ঃ তাহারা পড়িতেছে।

কথ্য বা চলতি ভাষা ঃ যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয় তাকে কথ্য বা চলতি ভাষারীতি বলা হয়। যেমন ঃ তারা পড়ছে।

সাধু ও চলতি রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের পার্থক্যের মধ্যে। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সাধু রীতিতে পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়, আর চলতি রীতিতে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়। তেমনি সর্বনামের ব্যবহারে সাধু রীতিতে পূর্ণরূপ আর চলতি রীতিতে সংক্ষিপ্ত রূপ স্থান পায়। সাধুরীতির নিজস্ব ভঙ্গি ও ছন্দ আছে। তেমনি চলতি রীতিরও। সংস্কৃত শব্দ, সমাসবদ্ধ শব্দ ইত্যাদি সাধু ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে হালকা শব্দ চলতি রীতিতে বেশি দেখা যায়। সাধুভাষা সে কারণে গুরুগম্ভীর কৃত্রিম—তার ব্যবহার মুখের ভাষায় নেই। তার আছে কেবল লিখিত রূপ। তাই তা লেখ্যরীতি। তবে সাধু রীতি বাংলা ভাষাভাষী সবাই লেখ্যভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সবার কাছেই তা বোধগম্য। সাধু রীতি সর্বজনীন লেখ্য ভাষারীতি। এর উদ্ভব পশ্চিমবঙ্গের এককালীন মৌখিক ভাষারূপ থেকে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের ভাষারূপেরও প্রভাব গৃহীত হয়েছে।

অপরদিকে, কথ্য বা চলতি রীতি মুখের ভাষা বলে উচ্চারণে হালকা। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারে সংক্ষিপ্ত, সর্বনামও ছোট আকারে ব্যবহৃত হয়। তদ্ভব শব্দ, দেশী ও বিদেশী শব্দ এ রীতিতে বেশি ব্যবহৃত হয়। এ রীতি কথাবার্তায় প্রয়োগ করা হয়। এখন সাহিত্যেও তার মর্যাদাপূর্ণ আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাধু রীতির নমুনা ঃ যে জাতির মধ্যে পুস্তকের আদর নাই, তাহারা অত্যন্ত ছোট, তাহাদের জীবন বড় অসম্মানের। জগতে কখনও তাহারা উচ্চাসন লাভ করিতে পারে না। সাহিত্যের অনুগ্রহে দুর্বল শক্তিমান, দরিদ্র রাজা, অবজ্ঞাত মহাপুরুষ হইতে সমর্থ হয়।

চলতি রীতির নমুনা ঃ বই কিনে কেউ কখনও দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবুও আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই।

সাধু ও চলতি রীতির বৈশিষ্ট্য

সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য

১. সাধু রীতির ক্রিয়াপদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদে তা লক্ষণীয়। যেমন—

সমাপিকা ক্রিয়া ঃ করিয়াছি, খাইয়াছি, পড়িয়াছি ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া ঃ করিয়া, খেলিয়া, পড়িয়া ইত্যাদি।

২. সাধু রীতিতে সর্বনাম পদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ তাহারা, আমাদিগকে, উহাদের ইত্যাদি।

৩. সাধু রীতিতে অনুসর্গ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ হইতে, থাকিয়া, দিয়া ইত্যাদি।

৪. সাধু রীতিতে তৎসম অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ তথাপি, যদ্যপি ইত্যাদি।

৫. সাধু রীতিতে তৎসম শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয় বলে তা গুরু-গম্ভীর।

৬. সাধু রীতি কৃত্রিম এবং তা প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী।

৭. সাধু ভাষায় সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ বেশি থাকে।

নিচের উদাহরণে সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে ঃ

১. সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের **করিয়া, সেই** উপায়েই **তাহাকে** পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের **করিয়া** তোলা সাহিত্যের কাজ।

২. তোমার আত্মা **হইতে** যেমন তুমি বিচ্ছিন্ন **হইতে** পার না, সাহিত্যকেও তুমি তেমনি অস্বীকার **করিতে** পার না—**উহাতে** তোমার মৃত্যু—তোমার দুঃখ ও অসম্মান হয়।

চলতি রীতির বৈশিষ্ট্য

১. চলতি রীতির ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ায় তা প্রকাশ পায়। যেমন ঃ

সমাপিকা ক্রিয়া ঃ করেছি, খেয়েছি, পড়েছি ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া ঃ করে, খেলে, পড়ে ইত্যাদি।

২. চলতি রীতিতে সর্বনাম পদ সংক্ষিপ্তরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ তারা, এদের, ওদের ইত্যাদি।

৩. চলতি রীতিতে অনুসর্গের রূপ হয় সংক্ষিপ্ত। যেমন ঃ হতে, থেকে ইত্যাদি।

৪. চলতি রীতিতে তদ্ভব অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ তবু, যদিও ইত্যাদি।

৫. চলতি রীতিতে তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ফলে চলতি রীতি হালকা বা গতিশীল হয়ে থাকে।

৬. চলতি রীতি মুখের ভাষা বলে বাস্তবানুসারী এবং আঞ্চলিক উচ্চারণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৭. চলতি রীতিতে ভাষা হালকা করার জন্য সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ ভেঙে ব্যবহার করা হয়।

নিচের উদাহরণে চলতি রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে ঃ

১. পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ **তা** না মনে **করে একে** বিশ্বাস **করে, ভালবেসে** এবং যদি অদৃষ্টে থাকে ত ভালবাসা **পেয়ে**, মানুষের মত **বেঁচে** এবং মানুষের মত **মরে** গেলেই যথেষ্ট।

২. বৃক্ষের পানে **তাকিয়ে** আমরা লাভবান **হতে** পারি—জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন **হতে** পারি **বলে**।

ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা, অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। ..... একটির নাম সাধু ভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য ভাষা। আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।

যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রাম লাভ করবে।

৩. ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাধু ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সম্পত্তি। ইহার চর্চা সর্বত্র প্রচলিত থাকাতে, বাঙালির পক্ষে ইহাতেই লেখা সহজ হইয়াছে। ইহার ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি (বিশেষত ক্রিয়াপদের ও সর্বনামের) প্রাচীন বাংলা রূপ, এই সমস্ত রূপ সর্বত্র মৌখিক বা কথিত ভাষায় আর ব্যবহৃত হয় না। এই সাধু ভাষা মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন মৌখিক বা কথিত ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত ; তাহা হইলেও, পূর্ববঙ্গের বহু রূপ ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ইহার ওপর পড়িয়াছে।

৪. প্রমথ চৌধুরী

লিখিত ভাষা আর মুখের ভাষার মূলে কোন প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে। .... যেমন একটি প্রদীপ থেকে অপর একটি প্রদীপ ধরাতে হলে পরস্পরের স্পর্শ ব্যতিরেকে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তেমনি লেখার ভাষাতেও প্রাণসঞ্চার করতে হলে মুখের ভাষার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

৫. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

নানা প্রাকৃতিক দ্রব্যের ন্যায় ভাষা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে অলিখিতভাবে চলিতেছে। এইজন্য আমরা নিজেদের জীবৎকালে ভাষার পরিবর্তন বুঝিতে পারি না। লিখিত ভাষায় অনেক সময় কথ্যভাষার পরিবর্তন অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব প্রচলিত ভাষার রূপ রক্ষা করা হয়। তবুও ভাষার পরিবর্তন লেখায় ধরা পড়ে। আমরা এখন সাধুভাষায় 'চেয়ে,' 'এস', 'দেখ', 'জেলে', 'জলো' প্রভৃতি এমন শব্দ ও ব্যাকরণের রূপ ব্যবহার করি, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কথ্যভাষা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। সাধু ভাষার রীতি অনুসারে ইহাদের রূপ 'চাহিয়া,' 'আইস', 'দেখহ', 'জালিয়া', 'জলুয়া' হওয়া উচিত ছিল।

সাধু ও চলতি রীতির পার্থক্য

১. সাধু রীতির ক্রিয়াপদ প্রসারিত ও পূর্ণরূপে এবং চলতি রীতিতে তা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ সাধু রীতিতে—যাইতেছি, পড়িয়াছি ইত্যাদি ; চলতি রীতিতে তা হল—যাচ্ছি, পড়েছি ইত্যাদি।

২. সর্বনাম সাধু রীতিতে প্রসারিত ও পূর্ণরূপে এবং চলতি রীতিতে সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ সাধু রীতির সর্বনাম 'তাহারা', 'ইহাদের' ইত্যাদি চলতি রীতিতে 'তারা', 'এদের' ইত্যাদি রূপ লাভ করে।

৩. সাধু ভাষার অনুসর্গ 'হইতে', 'থাকিয়া' ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত হয়ে চলতি রীতিতে 'হতে', 'থেকে' রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি, অপেক্ষা > চেয়ে, দ্বারা, দিয়া > দিয়ে, বলিয়া > বলে, ধরিয়া > ধরে।

৪. সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য আর চলতি ভাষায় অ-তৎসম (তদ্ভব, দেশী, বিদেশী) শব্দের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন ঃ অষ্টপ্রহরীয় (তৎসম) > আটপৌরে (তদ্ভব), গৃহিণী (তৎসম) > গিন্নি (অর্ধতৎসম), কুম্ভকার (তৎসম) > কুমার (তদ্ভব) ইত্যাদি।

৫. সাধু ভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দ ও সন্ধিজাত শব্দ ব্যবহৃত হয়ে ভাষাকে আড়ম্বরপূর্ণ ও গম্ভীর করে তোলে, অন্যদিকে চলতি রীতি সেসব সমাসবদ্ধ ও সন্ধিজাত শব্দ ভেঙে ব্যবহৃত হয়ে উচ্চারণকে হালকা করে। যেমন ঃ হস্তধারণ > হাতধরা, গাত্রোত্থান > ওঠা, কৃষ্ণবর্ণ > কাল রং ইত্যাদি।

৬. অব্যয় ব্যবহারে সাধু রীতিতে তৎসম অব্যয় এবং চলতি রীতিতে তদ্ভব অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ সাধু রীতিতে 'তথাপি', যদ্যপি, চলতি রীতিতে 'তবু', 'যদি' ইত্যাদি।

৭. শব্দের স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি ও সমীকরণে সাধু ও চলতি রীতির পার্থক্য আছে। সাধু রীতিতে 'বাহিরে' চলতি রীতিতে 'বাইরে', সাধু রীতিতে 'বাহির' চলতি রীতিতে 'বের', 'বার' ইত্যাদি।

৮. শব্দগঠনের জন্য উপসর্গের প্রয়োগ সাধু রীতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ, কিন্তু চলতি রীতিতে সীমিত।

৯. সাধুরীতিতে সংস্কৃত প্রত্যয়ের নিয়ম মেনে চলতে হয়, চলতি রীতিতে নিয়ম না মানার প্রবণতা থাকে।

১০. ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য চলতি ভাষায় যত, সাধু ভাষায় তত নয়।

১১. সাধু ভাষায় বাক্যরীতি সুনির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু চলতি রীতিতে সুনির্দিষ্ট থাকে না। যেমন ঃ সাধু রীতিতে 'আমি কলেজে পড়িতে যাইতেছি।' চলতি রীতিতে বাক্যটি এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারে ঃ 'আমি কলেজে পড়তে যাচ্ছি'। 'আমি কলেজে যাচ্ছি পড়তে'। 'আমি পড়তে যাচ্ছি কলেজে', 'আমি যাচ্ছি পড়তে কলেজে।'

১২. প্রবাদ প্রবচন, বাগধারা যথাযথরূপে চলতি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। সাধু ভাষায় অনুরূপ বাগভঙ্গিমা থাকে না।

১৩. সাধু রীতি গঠনে কৃত্রিম, উচ্চারণে গুরুগম্ভীর, গতিতে ধীর ; অপরদিকে চলতি রীতি গঠনে স্বাভাবিক, উচ্চারণে হালকা এবং গতিতে সাবলীল।

সাধু ও চলতির গঠনে এসব পার্থক্য থাকায় লেখার সময় তা মেনে চলা দরকার। তবে লেখকের দক্ষতার ওপর তা নির্ভরশীল। বিশেষত গাম্ভীর্যের বিষয়ে এমনও দেখা গেছে সাধু রীতিতে হালকা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং চলতি রীতি হয়ে উঠেছে গাম্ভীর্যপূর্ণ —ভাব যথাযথ প্রকাশের জন্য কৃতী লেখকের হাতে তা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

সাধু ও চলতি রীতির কিছু নমুনা রচনাকালের ক্রম অনুসারে নিচে উল্লেখ করা হল। এ থেকে সাধু ও চলতি রীতির বিকাশের ধারাটি সম্পর্কে সহজে ধারণা করা যাবে।

ভাষারীতির নমুনা

সাধু ভাষারীতি

১. এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্ন বদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান; ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম পুলকিত চিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চির কাঙ্ক্ষিত ফল প্রত্যাশায় মহোৎসাহ সহকারে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং অবিলম্বে পর্বত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। — চারুপাঠ ঃ অক্ষয়কুমার দত্ত ; রচনাকাল ঃ ১৮৫৯

২. লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য ! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে ! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম ; লক্ষ্মণ ইতস্তত পর্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন ; গোদাবরী তীরে মৃদুমন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায় ! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

—সীতার বনবাস ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রচনাকাল ঃ ১৮৬০

৩. ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর ; কি জানি, যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তবে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল ; ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিলেন।

—দুর্গেশনন্দিনী ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রচনাকাল ঃ ১৮৬৫

৪. হানিফা ! একটি জীব সৃষ্টি করিতে কত কৌশল, তাহা তুমি জান ? সৃষ্ট জীবন বিনাশ করিতে তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। তোমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্যকুলের জন্ম হয় নাই। বিনাশ করা অতি সহজ, রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সৃজন করা আরও কঠিন। এত প্রাণী বধ করিয়াও তোমার বধেচ্ছা নিবৃত্ত হইল না। জয়ের পর বধ, ইহা অপেক্ষা পাপের কার্য আর কি আছে ? নিরাপরাধ প্রাণ বিনাশ করা অপেক্ষা পাপের কার্য জগতে আর কি আছে ? তুমি মহাপাপী ! তোমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, দুলদুল সহিত রণবেশে, রোজ কেয়ামত পর্যন্ত, প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ থাক।

—বিষাদ সিন্ধু ঃ মীর মশাররফ হোসেন ; রচনাকাল ঃ ১৮৯০

৫. তোমাকে কোন বেদুয়ীন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্প কোরকের মত, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন বাদশাহর ভৃত্য তোমাব নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিবীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিযা দিযা, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সে সাবঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজেব সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে ; শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে। বাহিরে দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাবশি দেবদূতের মত সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্ত কলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে।

—ক্ষুধিত পাষাণ ঃ গল্পগুচ্ছ ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; রচনাকাল ঃ ১৮৯৬

৬. জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, চুবি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতেই হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কে প্রচলিত করিল জানি না। ঈশ্বর ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চক্ষে জল আপনি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু মানুষ সখ করিয়া কাঁদে, কিম্বা দায়ে পড়িয়া কাঁদে, অথবা চিরপ্রসিদ্ধ মৌলিক আচার বলিয়াই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঁদিতে হয়—তাহা যাহারা ভালবাসিয়াছেন এবং তাহার পর কাঁদিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষ বলিতে পারেন। আমরা অধম, এ স্বাদ কখনও পাইলাম না, না

হইলে ইচ্ছা ছিল ভালবাসিয়া একচোট খুব কাঁদিয়া লইব, ভালবাসার ক্রন্দনটা মিষ্ট বা কটু পরীক্ষা করিব। আবার ইহাতে বড় আশঙ্কার কথাও আছে, শুনিতে পাই ইহাতে নাকি বুক ফাটা-ফাটি কাণ্ডও বাঁধিয়া উঠে, অমনি শিহরিয়া শত হাত পিছাইয়া দাঁড়াই—মনে ভাবি এ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সহসা গিয়া পড়িব না। অদৃষ্ট ভাল নয়—কি জানি যদি পরীক্ষা করিতে গিয়া শেষে নিজের বুকখানা ফাটাইয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হয় ; এ ইচ্ছায় আমি ঐখানেই ইস্তফা দিয়াছি।

— শুভদা ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; রচনাকাল ঃ ১৮৯৮

৭. আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে ? কোন ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে ? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমত উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতি রাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

—মতিচুর ঃ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঃ রচনাকাল ঃ ১৯০৫

৮. বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সূর্য শেষ দশায় পশ্চিম আকাশে টলমল টলমল করিতেছে, যেন ছলছল নয়নে কাহাব দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। মধ্যাহ্নের সে তেজ, সে দম্ভ, সে গর্ব আর নাই। 'চিরদিন কখন সমান না যায়।'—যেন মলিনমুখে এই দুঃখের গীত গাহিতে গাহিতে জগতের নিকট বিদায় লইতেছে। সিন্দুরিয়া মেঘ দিক আলো করিয়া উঠিয়াছে। শিশুরা আনন্দে তাহা দেখিতেছে আর নাচিতেছে। পাখিরা বেগে পাখা নাড়িয়া দিকে দিকে ছুটিতেছে, সন্ধ্যায় শীতল বাতাস দেহ জুড়াইয়া দিতেছে।

—জোহরা ঃ মোজাম্মেল হক; রচনাকাল ঃ ১৯১৭

৯. এখন আমাদের বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্বপ্রথম লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্ণার মত ঢেউভরা চপলতা ও সহজ মুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড় ও যাহার প্রাণ নাই, যে নির্জীব সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্য হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটিতে দেখা যায়। হইবে কোথা হইতে ? সাহিত্য হইতেছে প্রাণের অভিব্যক্তি, যাহার নিজের প্রাণ নাই, যে নিজে জড় হইয়া গিয়াছে, সে লেখার প্রাণ দিবে কোথা হইতে ? যাহার নিজের বুকে রঙের আলিপনা ফুটে না, যে চিত্তে রং ফুটাইবে কেমন করিয়া ? আমাদের অধিকাংশই হইয়া গিয়াছি জড়, কেননা আমাদের জীবন ভয়ানক একঘেয়ে ; তাহার না আছে কোন বৈশিষ্ট্য, না আছে কোন সৌন্দর্য। তাছাড়া, 'বোঝার ওপর শাকের আঁটির' মত আমরা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক, কাজেই বয়স কুড়ি পার না হইতেই আমরা গম্ভীর হইয়া পড়ি অস্বাভাবিক রকমের। আর, গম্ভীর হইলেই অমনি নির্জীব অচেতন প্রাণীর মত হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই যে চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জড়-ভরতের মত হাত-পা গুটাইয়া থাকা, ইহাই আমাদের প্রাণ শক্তিকে টুঁটি চাপিয়া মারিতেছে। সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউয়ের কলগান ও চঞ্চলতা।

—যুগবাণী ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ; রচনাকাল ঃ ১৯২২

১০. জাতি আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত। গ্রামে-গঞ্জেও এখন যন্ত্র দ্বারা নৌকা চালনার পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর মালবাহী যান্ত্রিক যান নির্মাণ ও চালনা শুরু হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও এখন সারাদেশেই অতীতের যে কোন সময় অপেক্ষা অধিক গতিশীল। অতএব ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, অদূর ভবিষ্যতে দেশের শহর-নগরসমূহে

আরও অধিক সংখ্যক মানুষের সমাবেশ ঘটিবে, অধিক সংখ্যক গ্রামীণ এলাকা শহর বা উপশহর হইয়া উঠিবে। এই অবস্থায় শহর সম্প্রসারণ বা নগরায়নে সুপরিকল্পনার ছাপ না থাকিলে শহরগুলো অচিরেই মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য হইয়া জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। তাই আমরা মনে করি, নগরায়ন যাহাতে যুগোপযোগী পরিকল্পনাভিত্তিক হইতে পারে তাহার জন্য অবিলম্বে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ মূহূর্তে বিরাজমান সমস্যাগুলির আশু সমাধানের জন্য পৌরসভাগুলির আয় বৃদ্ধি ও অর্থসংস্থানের জন্যও উপায় উদ্ভাবন করা জরুরী। তবে ইহাও ঠিক শহরবাসীর আদর্শ শহর গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সচেতন হইয়া প্রয়োজনানুযায়ী কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা বা কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি না করিলে এসব উদ্যোগের কোনটিই সফল হইবে না। — সম্পাদকীয় ঃ দৈনিক ইত্তেফাক ; রচনাকাল ঃ ১৯৯৮

চলতি ভাষারীতি

১. অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকারে ঘুর ঘুট্টি—গুড় গুড় করে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্ছে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্ছেন, আর হন হন করে চলেচেন। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ কচ্চে—দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে ;—গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।

সময় কারুরই হাত ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত... জীবের পবমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা করে না। গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠলো—রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরও বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুষলের ধাবে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো। — হুতোম প্যাঁচার নকশা ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ ; রচনাকাল ঃ ১৮৬২

২. এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক অন্ধকার ভালবাসার লোকের মত আমার কাছে চিরকাল নতুন। আমাদের দুজনকার মধ্যে এক খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে ঘাস হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবন্ত কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলেছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মত একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলোকে দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদগত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত।

— ছিন্নপত্র ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; রচনাকাল ঃ ১৮৯২

৩. আসল কথা হচ্ছে, যে-সকল কথা প্রমাণের ওপর নির্ভর করে তা আমাদের বিশ্বাস করবার দরকার নেই। যা একজন যুক্তির ওপর দাঁড় করায় তা আর একজনে যুক্তির দ্বারা ভূমিসাৎ করে। আর বিজ্ঞানে যা বলে তা সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, তোমার আমার কি এসে যায় বলো। পৃথিবী কমলালেবুর মত দেখতে বলেই সে আমার কাছে বড় রসালো ও মিষ্টি লাগছে তাও না, আর তিনকোণা হলেই যে আমার বড় বয়ে যেত তাও নয়। কি বল ? যেসব কথা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করি এবং যার কোনও প্রমাণ হতে পারে না, শুধু গায়ের জোরে বিশ্বাস করতে হয়, আমি সেই সব কথাই বিশ্বাস করতে ভালবাসি, কারণ তার জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কারও সঙ্গে মিছে তর্ক করতে হয় না।

— পত্র ঃ প্রমথ চৌধুরী ; রচনাকাল ঃ ১৮৯৮

৪. জাগো জনশক্তি। হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা। তোমার হাতের এ-লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক—উলটে ফেলুক। আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধুলায় লুটাও অর্থপিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তমাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা। যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আন। সকল অহঙ্কার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এস ঝুঁটি ধরে ঐ অর্থপিশাচ যক্ষগুলোকে। তোমাদের পিতৃপুরুষের রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে ঐ যক্ষের দেউল গড়া, তোমাদের গৃহলক্ষ্মীর চোখের জল আর দুধের ছেলের হৃৎপিণ্ড নিঙড়ে তাদের ঐ লাবণ্য, ঐ কান্তি। তোমাদের অভিশাপ-তিক্ত মারি-বিষ-জ্বালা লাগিয়ে তাদের সে কান্তি, সে লাবণ্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও। —রুদ্রমঙ্গল ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ; রচনাকাল ঃ ১৯২৭

৫. দেখো মনে সব থাকে। সেই ছেলেবেলা কবে কোন কালে দেখেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নীলে সাদায় নকশা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গা-ময় ফুটো, ওপরে টানিয়ে রাখত। ভিতরে চোঙের মত একটা কী ছিল তাতে খাবার দেওয়া হত। পাখিরা সেই ফুটো দিয়ে আসত, খাবার খেয়ে আর এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেত। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষের মনও তাই। স্মৃতির প্রকাণ্ড জালা, তাতে অনেক ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে স্মৃতি ঢুকছে আর বের হচ্ছে। জানালা খুলে বসে আছি, কতক বেরিয়ে গেছে কতক ঢুকছে ; কতক রয়ে গেছে মনের ভিতর; ঠোকরাচ্ছে ত ঠোকরাচ্ছেই, এ না হলে হয় না আবার। আর্টেরও তাই। এই ধরো না বিশ্বভারতীর রেকর্ড, রবিকাকা কোথায় গেলেন, কি করলেন, সব লেখা আছে। কিন্তু তা আর্ট নয়, ও হচ্ছে হিসেব। মানুষ হিসেব চায় না, চায় গল্প। হিসেবের দরকার আছে বই কি, কিন্তু ওই একটু মিলিয়ে নেবার জন্য, তার বেশি নয়। হিসেবের খাতায় গল্পের খাতায় এইখানেই তফাত। হিসেব থাকে না মনের ভিতরে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়, থাকে গল্প। — ঘরোয়া ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; রচনাকাল ঃ ১৯৪২

৬. বাংলা চিরকালই কবিতার দেশ। একমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যই বাঙালিকে কবি করেনি—তার কবিপ্রতিভার মূলে মননরীতির বৈশিষ্ট্যও সমানই পরিস্ফুট। বাংলার আকাশে নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি, আষাঢ়ের ঘন বর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য ও মহিমা, এবং শ্রাবণের দিবারাত্র অবিরাম বর্ষণধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি। ষড়ঋতুর বিচিত্র নৃত্যলীলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে বাঙালির কবিমানসের উৎস কোথায়। শরতের নীলাকাশে কূলে কূলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে। কাশের শ্বেত হাসিতে নদীকূল ভরে উঠে। হেমন্তের পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্বের নিরসন মেলে। শীতার্ত কুহেলী রাত্রির অবলুণ্ঠিত মায়াজালে নিদ্রিত ধরণীর যে জড়িমা, মানুষের আশা ও নিরাশার অঙ্কুর তারই মধ্যে প্রথম প্রকাশিত, বসন্তের বাতাসে নতুন উন্মাদনার সঙ্গে নবীন জীবনের সঞ্চার তারই মধ্যে নিহিত। ছয়টি ঋতুর এ বিচিত্র খেলা। প্রকৃতির চঞ্চল পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের সে ঐশ্বর্য যে বাঙালির মনকে কাব্যজগতে আকর্ষণ করেছে, তাতে বিচিত্র কি ?

— বাংলার কাব্য ঃ হুমায়ুন কবীর ; রচনাকাল ঃ ১৯৪২

৭. মাছি-মারা কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত, সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যেদিক দিয়ে ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে দুটো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায় এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আফসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ ত একটি বা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো ত সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।

— বই কেনা ঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ; রচনাকাল ঃ ১৯৫৩

৮. চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনায় যেমন একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনায়ও তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি ? অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাইনা। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

—সংস্কৃতি কথা ঃ মোতাহের হোসেন চৌধুরী; প্রকাশকাল ঃ ১৯৫৯

৯. গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় প্রায়ই। ছাড়া ছাড়া অর্থহীন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ জেগে উঠি। পরিচিত বিছানায় শুয়ে আছি এই ধারণা মনে আসতেও সময় লাগে। মাথার কাছের জানালা মনে হয় সরে গিয়েছে পায়ের কাছে। তৃষ্ণা বোধ হয়। টেবিলে ঢাকা দেয়া পানির গ্লাস। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেই হয় অথচ ইচ্ছে হয় না।

কোন কোন রাতে অপূর্ব জ্যোৎস্না হয়। সারা ঘর নরোম আলোয় ভাসতে থাকে। ভাবি, একা একা বেড়ালে বেশ হত। আবার চাদর মুড়ি দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। যেন বাইরের উথাল পাথাল চাঁদের আলোর সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে। একঘেয়ে কান্নার সুরের মত সে শব্দ। আমি কান পেতে শুনি। বাতাসে জামগাছের পাতার সর সর শব্দ হয়। সব মিলিয়ে হৃদয় হা হা করে উঠে। আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতায় কি বিপুল বিষণ্নতাই না অনুভব করি। জানালার ও পাশের অন্ধকার থেকে আমার সঙ্গীরা আমায় ডাকে। একদিন যাদের সঙ্গ পেয়ে আজ নিঃসঙ্গতায় ডুবছি।

— শঙ্খনীল কারাগার ঃ হুমায়ুন আহমেদ ; রচনাকাল ঃ ১৯৭৪

১০. ত্রাণসামগ্রী নিয়ে কোথাও কেউ যেন ছিনিমিনি খেলার সুযোগ না পায়, সে ব্যাপারে প্রশাসনকে কঠোর ও নির্মম হতে হবে। কোথাও কোন সুযোগসন্ধানী যেন নির্মাণ সামগ্রীসহ নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি করতে না পারে, সে ব্যাপারে প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে। আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সুষ্ঠুভাবে বানভাসিদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় সম্প্রচার ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নিয়মিত বিশেষ সংবাদ বুলেটিন প্রচারের ওপর জোর দিয়ে বন্যার্তসহ দেশের সকল নাগরিকের উদ্দেশ্যে এ মুহূর্তের জরুরী করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে যেতে হবে। সেগুলোর মধ্যে পানিবাহিত সবরকম রোগের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টি, পানি বিশুদ্ধকরণ, বন্যার পানি সরে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থায় প্রত্যেকের জরুরী করণীয় এবং মজুতদার, মুনাফাখোর, টাউট-বাটপাড়দের বিরুদ্ধে সর্বত্র সতর্ক গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং দেশবাসীকে যথাসাধ্য বন্যার্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো সংক্রান্ত পরামর্শ ও আবেদন থাকা বাঞ্ছনীয়। সরকার এবং দেশবাসীর সম্মিলিত, সচেতন ও সংগঠিত প্রয়াসই বানভাসি মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের গ্যারান্টি।

—দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ রচনাকাল ঃ ১৯৯৮

সাধু ও চলিত রীতির রূপান্তর

সাধু ও চলতি রীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং ভিন্ন ভাষারীতির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সাধু ও চলতি রীতির প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের বেলায়। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ হয় কালের জন্য—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের প্রেক্ষিতে, সেই সাথে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের পার্থক্যের দিক থেকেও। ক্রিয়ারূপের জন্য সাধু ও চলতি রীতিতে যে পার্থক্য ঘটে তা 'কর' ধাতুভিত্তিক ক্রিয়াপদের রূপভেদে দেখানো হল।

কাল		সাধু রীতি			চলতি রীতি		
		প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
বর্তমান	সাধারণ	করে	কর, করেন, কবিস	করি	করে, করেন	কর, করেন, করিস	করি
	ঘটমান	করিতেছে, করিতেছেন	করিতেছ, করিতেছেন করিতেছিস	করিতেছি, করিতেছি	করছে করছেন	করছ, করছেন করছিস	করছি
	পুরাঘটিত	করিয়াছে, করিয়াছেন	করিয়াছ, করিয়াছেন, করিয়াছিস	করিয়াছি	করেছে করেছেন	করেছ, করেছেন করেছিস	করেছি
	অনুজ্ঞা	করুক, করুন	কর, করুন, কর্		করুক, করুন	করো, করুন, করিস	
অতীত	সাধারণ	করিল,করিলেন	করিলে, করিলেন, করিলি	করিলাম	করল, করলেন	করলে, করলেন করলি	করলাম
	ঘটমান	করিতেছিল, করিতেছিলেন	করিতেছিলে, করিতেছিলেন, করিতেছিলি	করিতেছিলাম	করছিল, করছিলেন	করছিলে, করছিলেন, করছিলি	করছিলাম
	পুরাঘটিত	করিয়াছিল, করিয়াছিলেন	করিয়াছিলে, করিয়াছিলেন কবিয়াছিলি	করিয়াছিলাম	করেছিল করেছিলেন	করেছিলে, করেছিলেন, করেছিলি	করেছিলাম
	নিত্যবৃত্ত	করিত, করিতেন	করিতে, করিতেন, করিতিস	করিতাম	করত, করতেন	করত, করতেন, করতিস	করতাম
ভবিষ্যৎ	সাধারণ	করিবে, করিবেন	করিবে, করিবেন, করিবি	করিব	করবে, করবেন	করবে, করবেন, করবি	করব
	ঘটমান	করিতে থাকিবে, করিতে থাকিবেন	করিতে থাকিবে, করিতে থাকিবেন, করিতে থাকিবি	করিতে থাকিব	করতে থাকবে, করতে থাকবেন	করতে থাকবে, করতে থাকবেন, করতে থাকবি	করতে থাকব
	পুরাঘটিত	করিয়া থাকিবে, করিয়া থাকিবেন	করিয়া থাকিবে, করিয়া থাকিবেন, করিয়া থাকিবি	করিয়া থাকিব	করে থাকবে, করে থাকবেন	করে থাকবে, করে থাকবেন, কবে থাকবি	করে থাকব
	অনুজ্ঞা	করিবে, করিবেন	করিও, করিবেন করিস		করবে, করবেন	করবে, করবেন, করিস	

ক্রিয়াপদের এই বিভিন্নকালের ও পুরুষের রূপ থেকে সাধু ও চলতি রীতির পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। অনুরূপভাবে সকল ক্রিয়াপদের রূপভেদ লক্ষণীয়।

সর্বনাম পদের বেলায় সাধু ও চলতি ভাষারীতির পার্থক্য রয়েছে। তবে সব সর্বনামের বেলায় পার্থক্য থাকে না। কোন কোন সর্বনাম পদ একই রূপে উভয় রীতিতে ব্যবহৃত হয়। যেসব সর্বনাম পদের সাধু ও চলতি রীতির ভিন্ন রূপ তা নিচে দেখানো হল।

সর্বনাম পদ

সাধু রীতি	চলতি রীতি	সাধু রীতি	চলতি রীতি
তাহা	তা	ইহারা	এরা
তাহাতে	তাতে	ইহাদিগকে	এদের, এদেরকে
তাহারা	তারা	ইহাদিগের	এদের
তাঁহারা	তাঁরা	ইহাদের	এদের
তাঁহাদের	তাঁদের	উহা	ও
তাহার, তাহারও	তার, তারও	উহাকে	ওকে
তাহাদের, তাহাদিগের	তাদের	উহারা	ওরা
তাহাকে, তাঁহাকে	তাকে, তাঁকে	উহাদের	ওদের
তাহাদিগকে	তাদের, তাদেরকে	উহাদিগের	ওদের
তাঁহাদিগের	তাঁদের	উহাদিগকে	ওদেরকে
যাহা	যা	কাহাকে	কাকে
যাহারে, যাহাকে	যারে, যাকে	কাহার, কাহারও	কার, কারও
যাহাদের	যাদের	কাহারা	কারা
যাহাদিগকে	যাদের, যাদেরকে	কাহাদের	কাদের
ইহা	এ	কাহাদিগের	কাদের
ইহাকে	একে	কাহাদিগকে	কাদেরকে
ইহাতে	এতে	কেহ	কেউ
ইহার	এর	তোমাদিগকে	তোমাদের, তোমাদেরকে
		এই	এ

অনুসর্গ

সাধু রীতি	চলতি রীতি
হইতে	হতে, থেকে
থাকিয়া	থেকে
চাইতে	চেয়ে
দিয়া	দিয়ে
সহিত	সাথে
বলিয়া	বলে
করিয়া	করে
দ্বারা	দিয়ে

কখনও কখনও সাধু রীতির পদ চলতি রীতিতে দুটি রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন ঃ

সাধু রীতি	চলতি রীতি-১	চলতি রীতি-২
বলিল	• বলল	বললে
খাইলাম	খেলাম	খেলুম
করিলাম	করলাম	করলুম
চলিলাম	চললাম	চললুম
গেলাম	গেলাম	গেলুম
উল্টা	উল্টা	উল্টো
জুতা	জুতা	জুতো
গুলি	গুলি	গুলো
হিসাব	হিসাব	হিসেব
বিলাতি	বিলাতি	বিলেতি, বিলিতি
ভিতর	ভিতর	ভেতর

বাংলা উচ্চারণে ধ্বনি পরিবর্তনের স্বরসংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি প্রভৃতি নিয়ম আছে। এই তিনটি উচ্চারণ রীতির প্রভাবে সাধু ও চলতি রীতিতে পার্থক্য দেখা দেয়। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে পদের মাঝের স্বরধ্বনির লোপে এবং পদের মাঝের ই-কারের লোপে ভাষারীতির রূপভেদ দেখা যায়।

১. পদের মাঝের হ-কারের লোপে সর্বনাম পদের পরিবর্তন ঃ

সাধু রীতি ঃ তাহা, যাহা, ইহা, তাহার, তাহাকে, কাহারও ইত্যাদি।
চলতি রীতি ঃ তা, যা, এ, তার, তাকে, কারও ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় ঃ

সাধু রীতি ঃ কহিতে, গাহিতে, চাহিলে ইত্যাদি।
চলতি রীতি ঃ কইতে, গাইতে, চাইলে ইত্যাদি।

সমাপিকা ক্রিয়া ঃ কহিলে, গাহিলে, কহে, নহে ইত্যাদি।

চলতি রীতি ঃ কইলে, গাইলে, কয়, নয় ইত্যাদি।

শব্দ মধ্যবর্তী হ-কার লোপের আরও দৃষ্টান্ত ঃ

সাধু		চলতি	সাধু		চলতি
ফলাহার	>	ফলার	সিপাহি	>	সিপাই
বেহাই	>	বেয়াই	দধি	>	দই

২. ক্রিয়াপদের মাঝের ই বা উ ধ্বনির লোপ ঃ

সাধু রীতি ঃ যাইব, যাউক, জানাইব, খাওয়াইব ইত্যাদি।

চলতি রীতি ঃ যাব, যাক, জানাব, খাওয়াব ইত্যাদি।

৩. কখনও কখনও সাধু রীতির শব্দের আগের বা পরের স্বরধ্বনির প্রভাবে পদের মাঝের অন্য স্বরধ্বনির বদল হয়। একে স্বরসংগতি বলে। যেমন ঃ

ক. পরবর্তী অক্ষরে অ বা আ বা এ থাকলে পূর্ববর্তী ই-ধ্বনি, এ-ধ্বনিতে পরিবর্তন হয়।

সাধু ঃ লিখ, লিখে, লিখা, শিখা, লিখালিখি, শিয়াল ইত্যাদি।
চলতি ঃ লেখ, লেখে, লেখা, শেখা, লেখালেখি, শেয়াল ইত্যাদি।

খ. পরবর্তী অক্ষরে অ বা আ বা এ থাকলে পূর্ববর্তী উ-ধ্বনি ও-ধ্বনিতে বদল হয়।

সাধু ঃ শুন, শুনা, শুনে, বুঝ, উঠে, ফুটে, বুঝা, শুনাও, বুঝানো ইত্যাদি।

চলতি ঃ শোন, শোনা, শোনে, বোঝ, ওঠে, ফোটে, বোঝা, শোনাও, বোঝানো ইত্যাদি।

গ. পূর্ববর্তী ই-ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অক্ষরের আ-ধ্বনির এ-ধ্বনিতে পরিবর্তন হয়।

সাধু ঃ গিয়া, দিয়া, মিঠা, মিছা, ফিতা ইত্যাদি।

চলতি ঃ গিয়ে, দিয়ে, মিঠে, মিছে, ফিতে ইত্যাদি।

ঘ. আগে উ, ঊ থাকলে শেষের আ, ও হয়ে যায়।

সাধু ঃ তুলা, রূপা, ধূলা, উল্টা ইত্যাদি।

চলতি ঃ তুলো, রূপো, ধূলো, উল্টো ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ও স্বর সংগতির জন্য সাধু ভাষার পদের বদলে চলতি রীতির রূপের আরও কিছু নমুনা ঃ

সাধু		চলতি	সাধু		চলতি
করিয়া	>	করে	ঘুমাইয়া	>	ঘুমিয়ে
চলিয়া	>	চলে	খাইত	>	খেত
ভাসিয়া	>	ভেসে	হইত্	>	হত
ছুটিয়া	>	ছুটে	কহিত	>	কইত
খাইও	>	খেও, খেয়ো	চিনিত	>	চিনত
যাইও	>	যেও, যেয়ো	চাহিত	>	চাইত
গাহিয়া	>	গেয়ে	গাহিতে	>	গাইতে
দেখিয়া	>	দেখে	বহিলে	>	বইলে
নাহিতে	>	নাইতে			

এক ভাষারীতি থেকে অপর ভাষারীতিতে পরিবর্তন করতে হলে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার ঃ

সাধু রীতি থেকে চলতি রীতিতে

১. ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের প্রসারিত রূপকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে। যেমন ঃ পড়িয়াছি > পড়েছি, লিখিয়াছিলাম > লিখেছিলাম, আসিল > এল, উহাদিগকে > ওদের, তাহাদিগকে > তাদের, উহা > ও, ইহা > এ ইত্যাদি।

২. বিরল ও অপ্রচলিত তৎসম শব্দের বদলে তদ্ভব, দেশী বা বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

৩. গাম্ভীর্য কমিয়ে হালকা করার জন্য সংস্কৃত প্রত্যয় নিষ্পন্ন, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ ও সন্ধিযুক্ত পদের বদলে পরিচিত তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা দরকার।

৪. কয়েকটি অনুসর্গের পরিবর্তন করতে হবে। যেমন ঃ হইতে > হতে, থেকে, থাকিয়া > থেকে ইত্যাদি।

চলতি রীতি থেকে সাধু রীতিতে

১. ক্রিয়া ও সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপকে পূর্ণাঙ্গ করতে হবে। যেমন ঃ পড়ছি > পড়িতেছি, লিখছি > লিখিতেছি, যাদের > যাহাদিগের, এদের > ইহাদের ইত্যাদি।

২. তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের বদলে সমার্থক তৎসম শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে হবে।

৩. চলতি ভাষার নিজস্ব বাগধারার বদলে সমার্থক তৎসম শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

৪. কয়েকটি অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে পূর্ণরূপের ব্যবহার করতে হবে। যেমন ঃ হতে > হইতে, থেকে > থাকিয়া ইত্যাদি।

ভাষারীতি পরিবর্তনের উদাহরণ

১

সাধু রীতি ঃ এইরূপ চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মানুষের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক আঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল, তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

চলতি রীতিতে রূপান্তর ঃ এরূপ চারদিক চেয়ে দেখতে দেখতে সামনের দরজায় কি একটা ছায়ার মত দেখলেন। মানুষের আকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মানুষও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত এসে দরজায় দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে সে ছায়া যেন একটা হাত তুলল, অস্থিচর্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দিয়ে কাকে যেন সঙ্কেত করে ডাকল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাল। তখন সেরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকায়, উলঙ্গ প্রথম ছায়ার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর আর একটা এল, তারপর আরও একটা এল। কত এল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল।

২

সাধু রীতি ঃ আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে ? ভরসা করিয়া এইটুকু কোনদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চ শিক্ষাকে আমাদের দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে ? পশ্চিম হইতে যাহা কিছু শিখিবার আছে, জাপান তাহা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল। ইহার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তাহারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

চলতি রীতিতে রূপান্তর ঃ আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থেকে যাবে ? ভরসা করে এটুকু কোনদিন বলতে পারব না যে, উচ্চ শিক্ষাকে আমাদের দেশের জিনিস করে নিতে হবে ? পশ্চিম থেকে যা কিছু শেখার আছে, জাপান তা দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দিল। এর প্রধান কারণ, সে শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করতে পেরেছে।

৩

সাধু রীতি ঃ রানীরা মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া, কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, গা-মাথা শুকাইয়া, সকলে পাকশালে গেলেন। আজ বড় রানী ভাত রাঁধিবেন, মেজরানী তরকারী কাটিবেন, সেজ রানী ব্যঞ্জন রাঁধিবেন, ন-রানী জল তুলিবেন, কনে রানী যোগান দিবেন, দুয়ো রানী বাটনা বাটিবেন, আর ছোট রানী মাছ কুটিবেন। পাঁচ রানী পাকশালে রহিলেন ; ন-রানী কুয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটরানী বাঁশগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।

চলতি রীতিতে রূপান্তর ঃ রানীরা মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে, গা-মাথা শুকিয়ে, সকলে পাকশালে গেলেন। আজ বড় রানী ভাত রাঁধবেন, মেজরানী তরকারি কাটবেন, সেজ রানী ব্যঞ্জন রাঁধবেন, ন-রানী জল তুলবেন, কনে রানী যোগান দিবেন, দুয়ো রানী বাটনা বাটবেন, আর ছোট রানী মাছ কুটবেন। পাঁচ রানী পাকশালে রইলেন ; ন-রানী কুয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটরানী বাঁশগাদার পাশে মাছ কুটতে বসলেন।

৪

চলতি রীতি ঃ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। প্রথম যেদিন বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির রক্ত ঝরেছিল সেদিন থেকেই দীর্ঘ পরাধীনতার পর বাঙালির স্বাধীনতার পথে যাত্রা। সেদিন যাদের রক্ত ঝরেছিল, যারা মাতৃভাষার জন্য নিজের সবচেয়ে বড় সম্পদ নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিল, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। এই শহীদদের পরিচয় আমাদের সকলের জানা উচিত।

সাধু রীতিতে রূপান্তর ঃ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। প্রথম যেইদিন বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির রক্ত ঝরিয়াছিল সেই দিন হইতেই দীর্ঘ পরাধীনতার পর বাঙালির স্বাধীনতার পথে যাত্রা। সেইদিন যাহাদের রক্ত ঝরিয়াছিল, যাহারা মাতৃভাষার জন্য নিজের সবচাইতে বড় সম্পদ নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। এই শহীদদিগের পরিচয় আমাদের সকলের জানা উচিত।

৫

ভাষারীতি সংশোধন ঃ

তার নিজেকে ব্যক্ত করতে চায়। তার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহ্যবিকাশ তাই আশ্রয় করিতে করিতেই তার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়। আমরা মনের মধ্যে যা অনুভব করি কার্যই তাহার বাহ্য প্রকাশ। এ জন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল আবার কাজ যতই যে করতে থাকে ততই সে বাড়িয়া উঠতে থাকে। আমাদের আত্মারও সেরূপ সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করতে চায়।

চলতি রীতিতে সংশোধন ঃ তার নিজকে ব্যক্ত করতে চায়। তার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহ্যবিকাশ তাই আশ্রয় করতে করতেই তার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়। আমরা মনের মাঝে যা অনুভব করি কার্যই তার বাহ্য প্রকাশ। এজন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করার জন্য ব্যাকুল আবার কাজ যতই সে করতে থাকে ততই সে বেড়ে উঠতে থাকে। আমাদের আত্মাও সেরূপ সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করতে চায়।

সাধু রীতিতে রূপান্তর ঃ তাহার নিজেকে ব্যক্ত করিতে চাহে। তাহার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহ্যবিকাশ তাহাই আশ্রয় করিতে করিতেই তাহার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়। আমরা মনের মধ্যে যাহা অনুভব করি কার্যই তাহার মধ্যে বাহ্য প্রকাশ। এই জন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল আবার কাজ যতই সে করিতে থাকে, ততই সে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের আত্মাও সেইরূপ সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহে।

অনুশীলনী

১। সাধু ও চলতি রীতির গদ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। বাংলা সাধু ও চলতি রীতির পার্থক্য আলোচনা কর।

৩। সাধু ও চলতি রীতির পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৪। বাংলা গদ্যের সাধু রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত কর।

৫। সাধু ভাষার মৌলিক উপাদানগুলো আলোচনা কর।

৬। নিম্নের অংশটিকে সাধু রীতি থেকে চলতি রীতিতে রূপান্তরিত কর ঃ

দিব্যি আরামে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাল কাটাইবার দিন আর নাই। এখন আমরা প্রায় সকলেই কমবেশি আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়াছি। এই আত্মসচেতনতার পিছনে রহিয়াছে আমাদের শিক্ষা। শিক্ষা আর যাই না করুক, জীবনযাত্রার আদর্শ সম্বন্ধে যে আমাদের দৃষ্টিকোণ বদলাইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭। নিচের অনুচ্ছেদটি সাধু রীতি থেকে চলতি রীতিতে রূপান্তরিত কর ঃ

কাহার হৃদয় এত পাষাণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহাতে জাগে না ? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোন জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে ? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্মের নিকট মাথা নিচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই, শুধু লইয়াছিল তাহার ধর্মভাব আর কতকগুলি শব্দ।

৮। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর ভাষারীতি সংশোধন কর ঃ

ক. মাথা খুঁড়িয়া মরলেও তুমি কাহারও করুণার উদ্রেক করিতে পারবে না।

খ. উহাদিগকে গলাধাক্কা দিয়ে বাহির করে দাও।

গ. তিনি আমার পাশে থাকবেন এই আশ্বাসেই আমি কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি আমাকে গাছে তুলে দিয়াই মই কেড়ে লইলেন।

ঘ. জনমতকে মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ, মিছামিছি ওদের ক্ষেপাইয়া দিয়া কোন লাভ নেই।

ঙ. পৃথিবীর মধ্যে যাহা সবচেয়ে বড় জিনিস তা জানিবার ও বুঝিবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলিয়া যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে।

৯। ভাষারীতি পরিবর্তন কর ঃ

ক. এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এমনি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত ; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপর অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেল—তখন কত মুমূর্ষ হয়ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছে।

খ. দেশের পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে আমি অনেকদিন ধরে অনেক ঘুরেছি। ছোট বড়, উঁচু-নীচু, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ বহু লোকের সঙ্গে মিশে মিশে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করে রেখেছি। জনরব কে রটিয়েছে খুঁজে পাওয়া শক্ত এবং এর মধ্যে যত অত্যুক্তি আছে, তার জন্য আমাকেও দায়ী করা চলে না।

গ. মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগৎ এমন এক ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই, সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট কথাটির প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে, বল ত জগতে আর কে আছে ? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নাই, কাহারও নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না।

ঘ. মাতৃভাষার উন্নতি ছাড়া এ জগতে কোন্ জাতি বড় হইয়াছে ? সারা দেশটাকে মূর্খ রাখিয়া দুই-চারিজন লণ্ডনে উচ্চ জ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে কি লাভ হইল ? তোমার জ্ঞান, তোমার চিন্তা, যতদিন না তোমার প্রত্যেক দেশবাসীর আত্মাকে যাইয়া আঘাত করিতেছে, ততদিন তোমার উচ্চজীবনের কোন সার্থকতা নাই। তোমার জ্ঞানভাণ্ডারের মূল্য এক পয়সাও নয়।

ঙ. ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে, তাহাতে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার তৈল হইতে মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে, তাহার আরও মুল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে, তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।